শ্রীবুদ্ধদেব বসু

প্রাপ্তিস্থান
ইস্টার্ণ-ল-হাউস
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ * * * * * পৌষ ১৩৪৫

ছয় আনা

আরতি এজেন্সি, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে শ্রীঅনাথনাথ দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং ২৫৯ নং অপার চিৎপুর রোডস্থ কৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে শ্রীপ্রমথনাথ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উপহার
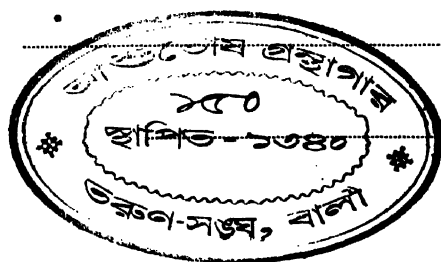
—সূচী—

সেবার গিরিডি গেছলাম এক বন্ধুর বিয়েতে। তখন শীত—আর কী শীত! ঠিক সন্ধেবেলা গিয়ে পৌঁছলাম—ষ্টেশনে পা দিয়েই মনে হ'ল যেন এক গলা ঠাণ্ডা জলে নামলাম। অতি কষ্টে যথাস্থানে এসে পৌঁছলাম—গায়ে তিনটে গরম জামা, তার উপর প্রাণপণে আলোয়ান জড়িয়ে জবুথবু হ'য়ে বসলাম। তবু কি শীত মানে! ঘরের দরজা-জানলা সব বন্ধ, তবু মনে হয় যেন কোনোখানে একটা দেয়াল নেই, খোলা মাঠের মধ্যে ব'সে আছি। দেয়াল ভেদ ক'রে ঢুকছে শীতের স্রোত, ঢুকছে আমাদের হাড় ফুটো ক'রে।

সে-রাতটা লেপ-কম্বল চাপা দিয়ে এক রকম কাটলো।

যখন ঘুমোলাম, কলকাতায় তখন সন্ধ্যা, তাই ঘুম ভেঙে গেলো খুব ভোরেই। কিন্তু তখন লেপের তলা থেকে ওঠবার চাইতে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়া সহজ। শুয়ে-শুয়েই প্রথম কিস্তি চা খেলাম; তার পর যখন বেশ ভালোরকম রোদ উঠেছে, উঠে এক ছুটে গেলাম বাইরে রোদ্দুরে।

বাইরে এসেই মনটা খুসিতে ভ'রে গেলো। কী নীল আকাশ, আর কী অজস্র রোদ! দূরে আঁকা-বাঁকা পাহাড় কুয়াসায় ঝাপসা; আর কন্‌কনে হাওয়াটা যেন শরীরটাকে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায়। দুপুর বেলা হী-হী ক'রে হাওয়া দেয়, গাছগুলো তাদের শুকনো পাতাগুলো ঝরিয়ে দিয়ে হাল্‌কা হয়—আর সেই শুকনো পাতা পায়ের নীচে মড়মড়িয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে কী ভালো আমার লেগেছিলো এখনো বেশ মনে পড়ে।

শীতের প্রথম ধাক্কাটা যখন স'য়ে গেলো, বাকি ক'টা দিন বেশ ভালই কাটলো। খাওয়া, বেড়ানো, গল্প করা—এ ছাড়া কিছু করবার নেই; কয়েক দিন প্রাণ ভ'রে বেড়িয়ে নিলাম।

এখন, গিরিডি যে কেন বিখ্যাত তা তোমরা ভূগোলের বইতে নিশ্চয়ই পড়োনি, কিন্তু লোকের মুখে বোধ হয় শুনেছো। ধিক্ তাকে—উশ্রী ফল্‌স্-এর নাম যে শোনে নি—যা হচ্ছে গিরিডির একমাত্র বৈশিষ্ট্য, গৌরব, সম্পদ্ এবং অলঙ্কার। সেখানকার

ছেলে-বুড়ো সকলের মুখে কেবল উশ্রী আর উশ্রী। তুমি ষ্টেশনে নামলে; গোল টাক-পড়া ষ্টেশন-মাষ্টার তোমার দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে বল্‌লে, 'উশ্রী ফল্‌স্ না দেখে যাবেন না কিন্তু।' যে-কুলি তোমার মোট বইলো, সে তোমাকে গায়ে প'ড়ে জানিয়ে দিলে যে উশ্রীতে যেতে হ'লে অনেকখানি হাঁটতে হয়। যে-ট্যাক্সিতে তুমি উঠলে, তার ড্রাইভার বল্‌লে, 'উশ্রীতে কবে যাবেন—আমাকে ব'লে দিন্, ঠিক আসবো।' সহরের যে-ভদ্রসন্তানের সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপ হ'ল, সে বল্‌লে, 'উশ্রীতে পৌঁছবার রাস্তাটা একটু গোলমেলে—যদি বলেন, আমি যেতে পারি সঙ্গে।' গেলে হয়-তো এক জায়গায় চায়ের নিমন্ত্রণে, গিয়ে শুনলে কে কতবার উশ্রী গেছে তারই আলোচনা চলছে। কেউ সাঁইত্রিশ বার, কেউ পঁচাত্তর বার, কেউ বিরানব্বুই বার। কী ক'রে যে ঠিক সংখ্যাটা মনে রাখতে পেরেছে, সেটাই আশ্চর্য্য। সমস্ত সহরটা উশ্রী দিয়ে ভরা। এখানকার শিশুরা প্রথম যে কথা শেখে তা হচ্ছে উশ্রী; আর বড় হ'য়ে উশ্রীর সঙ্গে সুশ্রী মিলিয়ে তারা কত যে পদ্য লেখে তার অন্ত নেই।

যা-ই হোক্, গিরিডি এসে অবশ্য উশ্রী দেখতেই হয়—ইচ্ছে করলেও না দেখে যাবার উপায় নেই। আমরাও দেখতে গেলাম—আমি, আর ভোম্বল—আমার বন্ধু। দুপুরে খাওয়ার পরে

দু'জনে বেরিয়ে পড়লাম একদিন। সবশুদ্ধ মাইল চারেক রাস্তা, তার অর্দ্ধেকটা ধরো, বনের ভিতর দিয়ে। বনের ধার পর্য্যন্ত সবাই মোটরে আসে, তার পর হেঁটে যায়। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম আগাগোড়াই হেঁটে যাবো।

এখন, ভোম্বল যে কেমনতরো মানুষ তা তার নাম শুনেই নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। বেজায় মোটা, কেবলি তার থেকে-থেকে ক্ষিদে পায়। সব চেয়ে সে ভালোবাসে পেট-ভরা খাওয়ার পর লম্বা হ'য়ে শুয়ে থাকতে। প্রথমটায় তো সে আসতেই চায় নি, অনেক ব'লে-ক'য়ে তাকে রাজি করলাম। বললাম 'ওরে মূর্খ, কলকাতার ইট-কাঠে আটক হ'য়েই তো জীবনটা কাটালি—এইবার একটু বাইরে তাকা, একটু দেখতে শেখ্—' ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক ভালো-ভালো কথা।

কিন্তু এত বক্তৃতা কার কাছে করলাম! সহর ছাড়িয়ে সবে বনের মধ্যে ঢুকছি, ভোম্বল বললে, 'একটা কথা।'

আমি হেসে বললাম, 'ভয় নেই রে, ভয় নেই। এ-বনে বাঘও নেই, ভাল্লুকও নেই, পরিষ্কার রাস্তা চ'লে গেছে বরাবর।'

ভোম্বল একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'সে-কথা নয়; ক্ষিদে পাচ্ছে।'

'ক্ষিদে! এই তো ভাত খেয়ে উঠলি।'

পাথরের উপর বসে জিরোতে লাগলাম—

'একবার খেলেই যদি আর কখনো খেতে না হ'তো তাহ'লে তো কোনো ভাবনাই ছিলো না।'

ভোম্বলকে আমি অবশ্য কোনো আমলেই আনলাম না!

সেই বন, বনের ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা, সত্যি বলতে, আমার বেশ ভালই লাগছিলো। চুপচাপ খানিক দূর গেছি, ভোম্বল হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'বুদ্ধি ক'রে কয়েকটা কমলালেবু নিয়ে এলেও হ'তো।'

আমি বললাম, 'এত বুদ্ধিই যদি তোর থাকবে তা হ'লে তুই এত মোটা হ'বি কেন? ক্ষিদে আর তেষ্টা ছাড়া আর কোনো জিনিস কি তোর মধ্যে নেই? চারদিকে একবার তাকিয়ে দেখ্ না, কী সুন্দর!'

ভোম্বল চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তার পর বল্‌লে, 'ফ্লাস্‌ক্‌-এ ক'রে চা আনলেও হ'তো।'

এইবার আমি সত্যি-সত্যি চটে গিয়ে বললাম, 'থাম্ তুই।'

ধমক খেয়ে ভোম্বল চুপ করলে। বাকিটা রাস্তা কোনো কথা বললে না। মাঝে-মাঝে আমি ওকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করাবার চেষ্টা করলুম, তা ও একবার বলে হুঁ, একবার বলে হাঁ।

উশ্রী দেখলাম। নিচে থেকে, উপর থেকে, এ-পাশ থেকে, ও-পাশ থেকে—যত রকম ক'রে দেখবার নিয়ম, কিছু বাকি রাখলাম না। তারপর পাথরের উপর ব'সে জিরোতে লাগলাম—আমার মনে অন্তত খুব একটা আত্ম-প্রসন্ন ভাব।

একটু পরে ভোম্বল বল্‌লে, 'এই, যাবি নে?'

'এত অস্থির হ'য়ে পড়েছিস্ কেন? কেমন লাগছে তোর বল্ তো?'

'কেন, বেশ—বেশ ভালোই তো।'

'কী সুন্দর ছাখ্। এ-রকম দেখেছিস্ কখনো?'

'না তো।'

ভোম্বলের সঙ্গে কোনো বিষয়ে কথা ক'য়ে সুখ নেই। একটু ক্লান্তই লাগছিলো, তা ছাড়া।

খানিক পরে আমি বল্‌লাম, 'চল্, তা হ'লে যাওয়া যাক্।'

ভোম্বল উঠতে-উঠতে করুণস্বরে বললে, 'বড্ড তেষ্টা পাচ্ছে ভাই।'

সত্যি বলতে, আমারও তেষ্টা পাচ্ছিলো, কিন্তু খুব প্রফুল্লমুখে বললাম, 'তোর প্যান্‌প্যানানির আর শেষ নেই? চল্, নামতে-নামতে ঝরণার জল খেয়ে নিবি এক ঢোঁক।'

উশ্রীর জল নাকি একটু খেয়েও দেখতে হয়, শুনেছিলাম। কিন্তু খেয়েই বুঝলাম, সেই কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলের চাইতে সে-সময়ে আমাদের অন্য কিছু প্রয়োজন। পেটের ভিতরটা মুচড়িয়ে উঠলো যেন। হঠাৎ ব'লে ফেললাম, 'গরম এক পেয়ালা চা পেলে কী ফাইন্ হ'তো ভাই।'

ভোম্বল গম্ভীরমুখে বললে, 'কী সুন্দর দৃশ্য!'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বললাম, 'কাছাকাছি কোথাও যে একটা ভাঙা পেয়ালাও জুটবে এমন আশা তো দেখি নে।'

ভোম্বল বললে, 'কী আকাশ! কী জল! কী বন!'

আমি চটে গিয়ে বললাম, 'ফাজলেমি রাখ্। তোর কি চা খেতে ইচ্ছে করছে না?'

'ক্ষিদে আর তেষ্টাই তো ভোম্বলের সম্বল।'

ততক্ষণে আমরা বনের পথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমার চা খাওয়া অভ্যাস, তার উপর রোদে এতখানি হেঁটে আর নানাদিক্ থেকে উশ্রী দেখে এমন হয়েছিলো যে সমস্ত শরীর আর মন কেবল চা-চা করছিলো। সত্যি, ফ্লাস্ক্ একটা নিয়ে এলেই হ'তো।

চুপচাপ চলেছি, হঠাৎ বনের মধ্যে একটু ফাঁকা জায়গা। একটু দূরে দেখতে পেলাম, সুন্দর একটি বাংলো-প্যাটার্নের বাড়ি ছবির মত ঝলমল করছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম।

'কী হ'লো?' ভোম্বল আমার মুখের দিকে তাকালো।

'ঐ বাড়িটা দেখছিস্?'

ভোম্বল তাকিয়ে বললে, 'দেখ্ছি তো।'

নাঃ, ভোম্বলটা একেবারে নিরেট। আমি বুঝিয়ে বললাম,

'চল্ না উঠি গে—চাইলে পরে এক পেয়ালা চা কি আর না দেবে !'

ভোম্বল একটু দ্বিধার সুরে বললে, 'যাবি ?'

'যাবো না কেন ? এই ঈশ্বর-পরিত্যক্ত জায়গায় হঠাৎ একটা বাড়ি কেন থাকবে বল্—আমাদের চা খাওয়াবার জন্যই নিশ্চয়ই ।'

যুক্তিটা ঠিক অনুধাবন করতে না পেরে ভোম্বল বললে, 'হুঁ ।'

'দেখ্ছিস না কী ঝক্‌ঝকে বাড়ি—নিশ্চয়ই বাঙালির। আমাদের দেখে কত খুশি হবে দেখবি—খালি চা ? আরো কত কিছু খাওয়াবে ।'

ভোম্বল ক্ষীণস্বরে বললে, 'চল্ তা হ'লে ।'

বাড়িটা যত কাছে ভেবেছিলাম, হাঁটতে গিয়ে দেখলাম ততটা নয়। আধ মাইলের কিছু উপরেই হবে। রোদে টুকটুকে লাল হ'য়ে এসে পৌঁছলাম দু'জন।

বাড়িটা একেবারে চুপচাপ, সামনের দরজা বন্ধ ভিতরে লোক আছে মনে হয় না। বারান্দায় উঠে দু'-একবার গলা খাঁকারি দিয়ে বললাম, 'কে আছেন বাড়িতে ?'

কেউ সাড়া দিলে না। আরো কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম, উত্তর নেই। তারপর দরজায় ধাক্কা।

ভিতর থেকে অত্যন্ত মোটা গলায় কে বললে, 'কে ?'

'একটু শুনবেন ?'

দরজা খুলে গেল একটু পরেই, আর ভীষণ রোগা, 'ডিস্-পেপ্‌টিক চেহারার এক ভদ্রলোক ভীষণ পুরু কাঁচের চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিটে চোখে আমাদের দু'জনকে দেখতে লাগলেন।

চেহারা দেখে সন্দেহ ছিলো না, তবু জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি বাঙালি ?'

'কী চাই আপনাদের ?' ঐ বঁড়শির মত শরীর থেকে অমন পিলে-চমকানো আওয়াজ কি ক'রে বেরুতে পারে, এখনো আমি মাঝে-মাঝে তা ভেবে অবাক্ হই।

'আজ্ঞে—আজ্ঞে—এই আমরা কলকাতা থেকে এসেছি।'

'ও। তা কি মনে ক'রে ?'

ভিতরটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যাচ্ছিলো, জোর ক'রে একগাল হেসে বললাম, 'আমরা এসেছিলাম উশ্রী দেখতে—'

'ও।'

'সমস্তটা পথ হেঁটে এসেছি—বড় ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছি।'

ভদ্রলোক আমাদের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তা-ই দেখছি।' নিজেও তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন দরজা আগলে, আমাদেরও একবার বসতে বললেন না।

কাচের পুরু চশমার ফাঁক দিয়ে মিটমিটে চোখে আমাদের দুজনকে দেখতে লাগলেন।

এইবার ভোম্বল বললে, 'সুন্দর বাড়িটি আপনার।'

'হ্যাঁ, অনেকের চোখে সুন্দর লাগে।'

ভোম্বল আবার বললে, 'আপনার দেশ কোথায় জানতে পারি?'

'বরিশাল।'

ভোম্বল মৃদু হাস্য ক'রে বললে, 'আমার দেশও বরিশাল।'

'ও, তাই নাকি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। তা দেখুন, আমরা বড্ড ক্লান্ত হয়েছি কিনা—এখানে একটু বিশ্রাম—' ভোম্বলের মুখ-চোখ বাকি কথা প্রকাশ করলে।

'আচ্ছা, দাঁড়ান একটু।'

আর কিছু না ব'লে ভদ্রলোক ভিতরে চ'লে গেলেন। আমাদের উভয়ের হৃৎপিণ্ড আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো। আমি চুপি-চুপি বললুম, 'তা হ'লে বোধ হয় শেষ পর্য্যন্ত চা-টা হ'ল।'

'ওঃ!' ভোম্বল এর বেশি কিছু বলতে পারলে না।

ভদ্রলোকের ফিরতে দেরি হ'তে লাগ্‌ল। আমি আরো বেশি চুপি-চুপি বললুম, 'কিছু খাবার-টাবার তৈরি করছে বোধ হয়। ভালো ক'রে আলাপ ক'রে দেখিস্—হয় তো কোন আত্মীয়তা বেরিয়ে পড়বে।'

প্রায় পনেরো মিনিট পর ভদ্রলোক ফিরলেন—তাঁর দু’ হাতে দু’ গেলাস জল।

—‘এই নিন।’

কী আর করি, গেলাস নিয়ে সেই দাঁতে-দাঁত-লাগানো জল খনিকটা খেলাম। পশ্চিমের জল—পেটে পড়তেই ক্ষিদে যেন আরো দাউ-দাউ ক’রে জ্বলে উঠ্‌ল।

মরিয়া হ’য়ে গেছলাম ততক্ষণে। ঢোঁক গিলে ব’লে ফেললাম, ‘আপনাদের তো এতক্ষণে চা খাওয়ার সময় হয়েছে।’

‘তা এক সময় খেলেই হয়।’

‘আচ্ছা, আমরা তা হ’লে একটু—এই একটু ঘুরে ঘুরে বেড়াই এদিক্‌-ওদিক্‌।’

‘এখানে কোথায় আর বেড়াবার জায়গা?’

দাঁত বা’র ক’রে বললাম, ‘বারান্দায় পাইচারি করি একটু—তারপর আপনারা যখন চা খাবেন—’

‘তা আপনাদের ইচ্ছা।’

ভদ্রলোক (যদি এখনো ভদ্রলোক বলা যায়) আবার ভিতরে চ’লে গেলেন। ভোম্বল ব’লে উঠলো, ‘আস্ত ভূতুম! ভাবখানা কি তা-ই বোঝা গেল না।’

'দেখি আর একটু ধৈর্য্য ধ'রে। নেহাৎ জীবে দয়া ব'লেও তো একটা জিনিস আছে।'

ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট গেলো, ভদ্রলোকের আর দেখা নেই। হয় তো ঘরে চিনি নেই, কোন্ দূরে বাজার, আনতে পাঠিয়েছে। বললেই হ'ত, চিনি ছাড়াই খেতুম। এদিকে বিকেল হ'য়ে আসছে, রোদের জোর ক'মে আসছে। শীত আরম্ভ হবে একটু পরেই। আবার সেই চার মাইলের পাড়ি—এক পেয়ালা চা না খেয়ে কী ক'রে পা বাড়াই ?

আবার হাঁক-ডাক সুরু করবো ভাবছি, এমন সময় ভদ্রলোক আবার দেখা দিলেন—হাতে তাঁর একটা চায়ের পেয়ালা। মোটে এক পেয়ালা—তবু মন লাফিয়ে উঠলো। যাক্, ঐ ভাগ ক'রে খাবো দু'জনে। সেটা নেবার জন্যে হাত বাড়াতে যাচ্ছি ভদ্রলোক পেয়ালায় এক লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, 'এ কী! আপনারা যান নি এখনও ?' ব'লে আর এক চুমুকে পেয়ালা শেষ ক'রে সেটা নামিয়ে রাখলেন। 'আমাদের তো চা খাওয়া হ'য়ে গেলো, আপনাদের না তখনই যাবার কথা ছিলো ?'

আমাদের বন্ধুকে আমরা প্রায়ই বলি, 'তুমি এত মজার-মজার গল্প বলতে পারো—একটু গুছিয়ে লিখে ফেলো না কেন?'

বন্ধু বলে, 'ও বাবা!'

'ও বাবা কেন? লেখা এমন কী শক্ত কাজ! আমরা সবাই তো লিখি—চোখের উপরই তো দেখতে পাও! এতগুলো জলজ্যান্ত দৃষ্টান্তেও কি একটু উৎসাহ হয় না তোমার মনে?'

সত্যি, আমাদের দেখেও যে বন্ধুর 'ইন্স্‌পিরেশন' হয় না, এটা ভারি আশ্চর্য্য। আমরা সবাই লেখক। আমি—আর টুনু,

আর সতীশ, আর নির্ম্মল। আমার লেখা তো তোমরা পড়েছো, আর টুন্নু কবিতা লেখে, তা হয়-তো তোমরা কখনোই পড়বে না। আর সতীশ আর নির্ম্মল তো বিরাট্ সাহিত্যিক, নাম নিশ্চয়ই শুনেছো তোমাদের বড় ভাই-বোনদের মুখে। হয়-তো কয়েক বছর পরেই আমার লেখা তোমরা আর পড়বে না, সতীশ আর নির্ম্মলের মধ্যে বড় লেখক কে তা-ই নিয়ে মারামারি করবে।

যেহেতু আমি ছেলেদের গল্প লিখি, তাই বঙ্কুকে আমার দলে টানতে চেষ্টা করলুম। বললুম, 'তুমি যে-সব গল্প বলো, আমি সে-সব লিখি, আর তা-ই প'ড়ে ছেলেরা খুশি হয়। তুমি নিজে যদি দু'-একটা লেখো—'

'তা হ'লে তোমার উপায় হবে কী?'

সতীশ বললে, 'ওর কপালে যা আছে তা-ই হবে। তাই ব'লে তুমি সারাদিন বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ ক'রে কাটাবে, ও আর আমরা সইতে পারি নে। লেখো। ভয় করো না—লিখতে-লিখতেই লেখা আসবে। আর কিছু না হোক, কয়েকটা টাকা তো পেতে পারো।'

টাকার কথা শুনে বঙ্কু উঠে বসলো। (এতক্ষণ সে একটা ইজি-চেয়ারে শরীরটাকে যতখানি সম্ভব ছড়িয়ে দিয়ে 'বিশ্রাম করছিলো'।) বললে, 'আমাকে কি কেউ টাকা দেবে?'

নির্ম্মল বললে, 'দেবে না আবার! তুমি লিখে এনে আমাদের হাতে দাও তো—টাকা পাও কি না পাও তা আমরা দেখবো।'

বঙ্কু মিটমিটে চোখে তাকিয়ে বললে, 'সত্যি তো?'

সতীশ বললে, 'যদি একটা বড় রকম গল্প সাজাতে পারো, যাতে আস্ত একটা বই হয়, তা হ'লে শ'-খানেক টাকা—'

'বলো কী!' বঙ্কু লাফিয়ে উঠলো, 'এক-শ'! এ—ত?'

'লেখোই না। তার পর দেখবে।'

বঙ্কু ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো আর বলতে লাগলো, 'আমি কি লিখবো—না, লিখবো না? লিখবো—না, লিখবো না? লিখবো, লিখবো, লিখবো। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই লিখবো। নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই—' (এখানে বঙ্কু দু' হাত মুঠো ক'রে মাথার দু'দিকে তিনবার টোকা দিলে।)

নির্ম্মল বললে, 'থাক্। একটু শান্ত হ'য়ে বোসো তো এবার।'

বঙ্কু হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলো, 'হয়েছে! হয়েছে! এক তিমির গল্প লিখবো—এক বাচ্চা তিমি মা-বাপের ওপর রাগ ক'রে একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে—য়্যাট্‌লান্টিক থেকে প্যাসিফিকে—তার য়্যাডভেঞ্চার। কেমন হবে?'

'বেশ হবে। আজ বাড়ি গিয়েই লিখতে আরম্ভ করো। দেরি কোরো না।'

'পাগল! সাত দিনের মধ্যে যদি তোমাদের হাতে বই এনে না দিয়েছি—'

সতীশ মুচকি হেসে বললে, 'থাক, অত তাড়া না করলেও চলবে।'

'শেষটায় যদি টাকা না পাই, তা হ'লে কিন্তু—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, লেখো তো।

'বই লেখা হ'য়ে গেছে মনে করতে পারো। পাব্লিশারের খোঁজ করতে থাকো। শেষটায় যদি বলো—'

'সে-জন্যে তুমি ভেবো না।' আমরা সবাই ওকে সাধ্য-মত আশ্বাস দিলুম। বন্ধুর চেহারা দেখে মনে হ'লো সে বাড়ি গিয়েই টেবিলে বসবে, উঠবে লেখা শেষ ক'রে। স্বাধীন উপার্জ্জনে ওর দারুণ উৎসাহ। একবার সে-জন্য ছেলে পড়াতে গিয়েছিলো— তার ফল হয়েছিলো হার্ট্‌ব্রেকিং। এবার হয়-তো বন্ধু তার কুড়েমির সমুদ্র থেকে সত্যি-সত্যি গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে—ভেবে আমরা সবাই খুশি হ'লাম।

* * *

এর পর কয়েকদিন বন্ধুর মুখে বই ছাড়া আর কিছু নেই। বইয়ের কী নাম হবে, কত বড় হওয়া দরকার, হাতের লেখার ক' পৃষ্ঠায় মাপ-সই বই হবে, টাকাটা বই শেষ করবার ক'দিনের

মধ্যে পাওয়া যেতে পারে—এমনি এক-শ' কথা, থেকে-থেকে হঠাৎ চাড় দিয়ে ওঠে। আমরা হয়-তো টেস্‌ট্‌ খেলার কথা আলাপ করছি, কি জ্যোতিষশাস্ত্র, কি চীনের ইতিহাস নিয়ে, হঠাৎ মাঝখান থেকে বঙ্কু ব'লে উঠলো,—'আচ্ছা, "তিমি-উপাখ্যান" নামটা কি ভালো হ'ল?' কি হয়-তো, 'বাচ্চা তিমিকে শেষ পর্য্যন্ত মেরে ফেলবো কি না ভাবছি। ট্র্যাজিক্‌-এণ্ডিং কি ছেলেরা পছন্দ করবে?' কি, অনেকটা নিজের মনেই 'তিমি সম্বন্ধে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া ব্রিট্যানিকা একটু দেখে নিলে ভালো হয়। ইম্পিরিয়াল্‌ লাইব্রেরিতে যেতে হবে একদিন।'

আমরা সাধ্য-মত পরামর্শ দিলুম, উৎসাহ দিলুম, সাহায্য করলুম। তিমির জীবন-চরিত চুল-চেরা ক'রে আলোচিত হ'লো। মুখ থেকে মুখে, গল্পটাও প্রায় তৈরি হ'য়ে গেলো—এখন লিখে ফেললেই হয়!

'লেখা আরম্ভ করেছো তো? সতীশ একদিন জিজ্ঞেস করলে।

ওঃ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু বানানগুলো ভাই তোমাদের একটু ঠিক ক'রে দিতে হবে।'

সাতদিন গেলো, দশ দিন গেলো, পনেরো দিন গেলো।— 'কী হে, কতদূর?' আমরা জিজ্ঞেস করলুম।

'এই হচ্ছে, হচ্ছে।' বঙ্কু আর কিছু বললে না। ক'দিন

থেকে তার উৎসাহ যেন একটু ক'মে আসছে! বইয়ের কথা উঠলে তাড়াতাড়ি অন্য কথা পাড়ে।

'সত্যি লিখছো তো?' আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'বাঃ, শেষ হ'য়ে এলো', বন্ধু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো। 'কিন্তু আরো একটু দেরি হবে। একটা ফেয়ার কপি করতে হবে কিনা —যা কাটাকুটি হয়েছে।'

মাঝখানে কয়েকদিন বন্ধুর দেখা নেই। আমরা মনে করলুম খুব ক'ষে লিখছে বুঝি। যাক্, তবু যদি ওর একটা কাজ হয়! একটা ছেলে সারাদিন ধ'রে এ-পাশ ও-পাশ করছে আর হাঁসফাঁস করছে, এ আর চোখে দেখা যায় না!

•

কিন্তু বন্ধুর যে একেবারে দেখা নেই, এ-ও আর সহ্য করা যাচ্ছে না। কেননা বন্ধুর মত এমন মজার গল্প করতে আর কে পারে? এত রকমের গল্প আছে আর কার পুঁজিতে, আর সে-সব এমন হাসির ঢঙে বলতেই বা কে পারে? বই লেখা খুব ভালো কাজ সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই ব'লে বন্ধুদের এ রকম পরিত্যাগ করবার কোনো মানে হয় না। তাই একদিন গেলুম ওর কাছে দল বেঁধে, ও কেমন আছে দেখতে।

'একটু দেখে আস্‌বে ?' 'পারবো না।'

প্রথমে দেখা হ'লো ওর ন' বছরের বোন মিলির সঙ্গে। মিলিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'ন'দা কোথায় ?'

মিলি ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, 'জানিনে।'

'বাড়ি নেই?'

'জানি নে।'

'একটু দেখে আসবে?'

'পারবো না।'

মিলি সাধারণত খুব লক্ষ্মী মেয়ে, কথা বললে শোনে। আজ তার হ'ল কী? অবাক্ হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকালুম। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললে, 'ন'দা বই লিখছে।'

'কী করছে?' কথাটা চট্ ক'রে বুঝতে পারলুম না।

'ব ই লি খ ছে', মিলি চেঁচিয়ে বললে।

নির্ম্মল খুশি হ'য়ে বললে, 'ও, ভালোই ত।'

'হ্যাঁ, ভালো!' অতটুকু মেয়ের মুখে অতখানি ঝাঁঝ দেখে আমরা অবাক্ হ'য়ে গেলুম। 'আমাদের ওঁর ঘরে যাওয়া বারণ', মিলি বলতে লাগলো। 'তুপুর-বেলায় কেউ একটু হুঁ করেছে কি রক্ষে নেই—তিনি আসবেন ছুটে—কেউ যেন গোল না করে, তিনি লিখছেন! আর কোথায় কাগজ, কোথায় পেন্সিল কোথায় ছুরি—রাজ্যের জিনিস তাঁর কাজে লাগে—আর কিছু খুঁজে না পেলেই—নিশ্চয়ই মিলি নিয়েছে, পল্টুর হাতে ছুরিটা দেখেছিলুম, মন্টু তখন আমার কলম দিয়ে লিখছিলো। মানুষের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—ওঁর জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে

যাবে! সেদিন আমি দরজার ফাঁক দিয়ে এই এ-ক-টু খানি উঁকি মেরেছিলুম—উনি টেবিলে ব'সে কলম চিবোচ্ছেন, চোখ কপালে উঠেছে, মুখখানা ঠিক যেন বাঙ্‌লা পাঁচ! ও রকম বিদ্‌ঘুটে চেহারা দেখলে কার না হাসি পায়! তা-ও আমি তো বেশি হাসিনি, একবার মোটে হি-হি-হি—ইচ্ছে ক'রে-তো আর হাসিনি—হাসি এসে গিয়েছিলো—অমনি ছুটে এসে—' মিলির গলা আটকে এলো, সে তার কথা শেষ করতে পারলে না।

অবাক্ হ'য়ে গেলুম। ভাবা যায় না, বঙ্কু যে কখনো কারো গায়ে হাত তুলতে পারে। সে এমন নিরীহ, এমন ভালোমানুষ, এমন মিষ্টি তার স্বভাব! বই লিখতে হ'লে, জানা গেল, কেবল বন্ধুদের পরিত্যাগ করতেই হয় না, ছোট বোনকেও মারতে হয়। যাক্, তবু যদি ওর বইটা লেখা হ'য়ে থাকে, সেটা কম কথা নয়। খুব নরম সুরে বললুম, 'ন'দা তা হ'লে বাড়িতেই আছে—কী বলো?'

'যান্ না আপনারা উপরে।' আমাদের কাছে দুঃখের কথা ব'লে ফেলে মিলির মন একটু ভালো হ'য়ে গিয়েছিল।

* * *

গেলুম ওপরে। বঙ্কুর ঘরের দরজা ভেজানো ছিল, ধাক্কা

দিতেই খুলে গেল। ঢুকে দেখলুম, খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে বঙ্কু—ঘুমুচ্ছে।

আমরা ডাকলুম, 'বঙ্কু—বঙ্কু!'

বঙ্কুর সাড়া নেই। তখন একজন এগিয়ে গিয়ে তার গা ধ'রে জোরে ধাক্কা দিলে। ধড়মড় ক'রে বঙ্কু জেগে উঠলো। 'এ কি! তোমরা কখন্ এলে?'

'এখনো ঘুমুচ্ছো! পাঁচটা বাজে যে!' সতীশ বললে।

বঙ্কু খাট থেকে নামলো।—'এই ত ভাই, এক্ষুনি একটু শুয়েছিলুম, কখন্ ঘুমিয়ে পড়েছি টেরও পাই নি। সারাটা দিন লিখে এত ক্লান্ত হয়েছিলাম!'

'কী হ'ল? শেষ?'

'হ্যাঁ, শেষ। মানে—একটু বাকি। শেষই বলতে পারো।'

আমি বললুম, 'তোমার যে দেখাই নেই এ ক'দিন? খেয়ে-না-খেয়ে লিখছিলে নাকি?'

'হ্যাঁ ভাই, বড্ড ব্যস্ত ছিলুম—সময় ক'রে উঠতে পারিনি। তা তোমরা এলে—ভালোই হ'ল। বোসো। একটু চায়ের কথা বলি।'

'চা হবে'খন', টুনু বললে, 'আগে দেখি তোমার লেখা।'

'না—না—এখন কী দেখবে ছাই ও-সব? সবাই এসেছো, একটু গল্প করা যাক্।'

সতীশ বললে, 'না, বার করো তোমার লেখা। আমরা দেখবোই। সেইজন্যই তো এসেছি সবাই মিলে।'

বঙ্কু মুখচোরা ধরণে হেসে বল্‌লে, 'পাগল! যা কাটাকুটি, কিছু পড়তে পারবে না।'

নির্ম্মল বললে, 'খুব পারবো, নিয়ে এসো না।'

'না, না—তা হয় না। অনেক ভুলচুক রয়ে গেছে, ভালো ক'রে রিভাইস্ না ক'রে—'

'আঃ—রেখে দাও ও-সব। তুমি কি লিখেছো দেখবার জন্য আমরা ছট্‌ফট্ করছি সবাই। তা-ও তো হ'তে-হ'তে প্রায় একমাস নিলে।'

'বাবাঃ—যা খাটুনি! কী ক'রে এত লেখো তোমরা!'

'দাঁড়াও না—তুমিও এতই লিখবে। দেখি না, কোথায়?'

তখন আমরা সবাই একসঙ্গে বলতে লাগলুম,'কই, নিয়ে এসো তোমার বই।—আমরা দেখবোই—আমাদের দেখাতেই হবে।'

আর বঙ্কু প্রাণপণে বলতে লাগলো, 'না—না, এখন নয়, এখন নয়। আমি ঠিক শেষ ক'রে তোমাদের কাছে নিয়ে যাবো —শিগ্‌গিরই। এখন দেখে কী করবে?'

'দেখি না, নিজেরাই খুঁজে বার করতে পারবো', ব'লে টুনু বঙ্কুর টেবিলের কাগজ-পত্র ঘাঁটতে লাগলো।

বন্ধু চীৎকার ক'রে উঠলো, 'এই—ওখানে হাত দিয়ো না।' ব'লে সে ছুটে গিয়ে টুনুর হাত ধরতে যাচ্ছিল, কিন্তু টুনু তার আগেই সোল্লাসে ব'লে উঠলো, 'এই তো! এই তো!' কিন্তু তার পরেই হঠাৎ সে একেবারে চুপ ক'রে গেল।

আমরা সবাই টুনুকে ঘিরে দাঁড়ালুম। টুনুর হাতে আস্ত একটা নতুন রাইটিং প্যাড, তার প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা,

ভিমি-উপাখ্যান

প্রথম পরিচ্ছেদ

তার পর সব শাদা। আমরা প্যাডের কাগজগুলো একবার উল্‌টিয়ে গেলুম, কিন্তু আর কোথাও একটা কালির আঁচড় নেই। কেবল এই ক'টি কথা জ্বলজ্বল্ ক'রে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে,

ভিমি-উপাখ্যান

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই ক'টি কথার উপর এত বার কলম বুলানো হয়েছে যে এক-একটা অক্ষর প্রায় মানুষের আঙুলের সমান মোটা।

খানিকক্ষণ আমরা সবাই চুপ ক'রে রইলুম, তার পর বন্ধুর দিকে মুখ ফেরাতেই হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'না—লিখিনি, লিখিনি—কী করবে এবার? নাও, হ'ল তো? বই লিখিনি।

লিখিনি—কখনো লিখবোও না। হ্যাঁঃ—গায়ের জোরে এক-জনকে দিয়ে বই লেখাবেন—আহ্লাদ আর কি! না, লিখবো না, কিছুতেই লিখবো না—কী করবে? ম'রে গেলেও লিখবো না। ভদ্রলোকে আবার বই লেখে! যত সব ফাজিল—ফাজিল—ফাজিল—'

ভদ্রলোকে আবার বই লেখে! যত সব ফাজিল—ফাজিল—ফাজিল—'

বলতে-বলতে, আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে বঙ্কু ছুটে বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। আমরা হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।—

খুকীর নাম

দিদির এক খুকী হয়েছে; বয়েস তা'র সাতদিন হ'তে চল্‌লো।

বাড়ীতে খুকী নামের আর একটি যে মানুষ আছে, তা'র বয়েস তেরো, গোখ্‌লে মেমোরিয়লে সে পড়ে। সে বল্‌লে, 'তোমরা আর কেউ ওকে খুকী বল্‌তে পারবে না—এখন থেকে ডাক্‌তে ডাক্‌তে শেষটায় ওর নাম খুকীই হ'য়ে যাবে। খুকী—কী ভীষণ হোপ্‌লেস্‌ নাম!'

তার নিজের খুকী নামের বিরুদ্ধে সে বড় হ'য়ে অবধি প্রাণ-পণে প্রতিবাদ ক'রে এসেছে, ফল হয় নি কোনো। তার যে আর একটা নাম আছে, আভা, তা যেন ভুলেই গেছে সবাই;

সব চেয়ে ভুলেছেন তাঁরা, যাঁরা ও-নাম রেখেছিলেন। অবিশ্যি আভা নামটাও যে তা'র খুব পছন্দ হয়, তা নয়—আভা, কেমন যেন সেকেলে গন্ধ! মানুষ কেন বড় হ'য়ে তা'র নিজের নাম বদ্‌লে রাখ্‌তে পারে না ইচ্ছেমত!

যা-ই হোক্, নিজের নাম তো যা হবার হয়েছে, এখন দিদির মেয়েকে নিয়ে ভাবনা। বাড়ির লোকগুলো এমন—হয়-তো ওর নাম সুরমা কি বিমলাই রেখে বস্‌লো!

আভা—আমরা তা'কে আভাই বল্‌বো—মনে-মনে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌লে বাড়ির লোকের বিরুদ্ধে। বল্‌লে, 'আমি রাখ্‌বো খুকীর নাম'।

কোত্থেকে মাণিক বলে উঠ্‌লো ফট্ ক'রে, 'তা হ'লেই হয়েছে!'

মাণিক দস্তুর মতবড় হয়েছে; বালিগঞ্জ ইস্কুল থেকে সে ম্যাট্রিকুলেশন দেবে সামনের বার। আভাকে সে মনে মনে জানে ছেলেমানুষ।

আভা মনে-মনে জানে যে তার ছোড়-দা, এই মাণিক নির্ব্বুদ্ধিতার একটি গৌরীশঙ্কর। সে ভুরু বাঁকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বল্‌লে, 'তুই এ-সব বিষয়ে কথা বল্‌তে আসিস কেন? যা, ফুটবল খেল গে।'

মাণিক সে-কথা কিছুমাত্র গায়ে মাখ্‌লে না; একজন শিশু কি বলে আর না বলে, তা আমরা আমলেই আনিনে। সে গম্ভীর মুখে বললে, 'আমি একটা চমৎকার নাম ভেবে রেখেছি খুকীর জন্য।'

আভা বেণী দুলিয়ে বললে, 'হ্যাঁঃ, তোর আবার চমৎকার!'

'দেখ্‌বি?'

'কী আর দেখ্‌বো! পারুলবালা কি সুরকুমারী কি কনকলতা কি ঐ গোছের একটা হবে আর কি! তোর যা taste!'

'আর তোর যত বীণা আর মীরা আর ললিতা আর লতিকা —তা-ই খুব ভালো তো? এক-একটা নাম-শুন্‌লে ইচ্ছে করে ম'রে যাই।'

'ওমা', আভা খিল্‌খিল্‌ ক'রে হেসে উঠ্‌লো, 'আমি বুঝি তাই বল্‌তে যাচ্ছি! ও-সব নাম তো আজকাল একেবারে প'চে গেছে।'

মাণিক বল্‌লে, 'আমি যা একটা ভেবেছি, তা একেবারে আশ্চর্য্য! তাক্‌ লেগে যাবে তোর শুন্‌লে।'

'ছাই! হতো যদি কুকুরের নাম, তা হলে অবিশ্যি তুই—'

'বেশী তড়্‌বড়্‌ করিস্‌নে—বুঝলি? এ-সব পুতুলের নাম রাখা নয়, মনে রাখিস্‌।'

পুতুলের কথা তোলায় আভা ভীষণ অপমানিত হ'লো। হবারই কথা; বেশিদিন নয়, সে পুতুলখেলা ছেড়েছে, সেইজন্য এখন তার চোখে ও-সব ভয়ঙ্কর ছেলেমানুষি। লাল হ'য়ে উঠে সে বল্‌লে, 'আর তুই তো সেদিনও লাট্টু ঘোরাতিস্ বোঁ-বোঁ ক'রে। আর মার্ব্বেল ভেঙে ফেলে যে দু' ঘণ্টা কেঁদেছিলি ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্ ক'রে, মনে নেই?'

'যা-যাঃ, অঙ্কে লাড্ডু পাস্, আবার কথা বল্‌তে আসিস্!'

'আর তুই যে একদিন জিওগ্রাফির ক্লাসে দাঁড়িয়েছিলি বেঞ্চির উপর—জানিনে বুঝি!'

'ভাগ্ এখান্ থেকে রাক্ষুসি।'

'তুই তো কুলির দলের সর্দার, জন্মে সাবান মাখবি নে গায়ে।'

আলাপের বিষয়টা ক্রমেই খুকীর নাম থেকে দূরে স'রে পড়ছিলো; এবং আরো নানারকম সব কথা উঠতে পারতো, যা শুন্‌তে মোটেও ভালো নয়—এমন কি, কথা-কাটাকাটি থেমে গিয়ে খানিকটা হাতাহাতিও হ'তে পারতো, যদি না ঘড়ির দিকে তাকিয়ে আভা হঠাৎ আবিষ্কার করতো যে এক্ষুনি স্নান করতে না গেলে ইস্কুলের বাস ফেল্ করবে।

* * *

কমল, ওদের মেজদা, এবার সেকেণ্ড ইয়ারে উঠলো; মাসিক-

পত্রে তার কবিতা বেরোয়। সম্প্রতি সে চুলের চর্চ্চা করছে; আর চাদর জড়াচ্ছে অগোছাল ক'রে—যেন এক্ষুনি খসে পড়বে গা থেকে।

সে বল্‌লে, 'খুকীর নামের জন্য ভাবনা কী, রবীন্দ্রনাথকে আমি এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি একটা নামের জন্য।' সে একবার তার অটোগ্রাফের খাতায় দু' লাইন পদ্য লিখিয়ে এনেছিল রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে; আর-একবার এম্পায়ারে কী-এক পালা হচ্ছিলো, ভাঙবার সময় সে দাঁড়িয়েছিলো দরজার এক পাশে, রবীন্দ্রনাথ কাছে আসতেই ঢিপ্‌ ক'রে এক প্রণাম করেছিলো আর তিনি তাকে বলেছিলেন, 'ভালো আছো?'. সেই থেকে—তার কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা তুল্‌তে কেউ যেন আর সাহস না পায়!

আভা ঠোঁটের একটা ভঙ্গি ক'রে বল্‌লো, 'রবিবাবুর আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই, তিনি গেছেন তোমার ভাগ নির নাম রাখতে!'

'আন্দাজে বক্‌বক্‌ করিস্‌নে।' কমল দিলে এক ধমক, 'জানিস্‌, উনি কত ছেলেমেয়ের নাম রেখে দিয়েছেন! আমি চিঠি লিখ্‌লে নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবেন একটা নাম।'

'তা কেন? আমরা নিজেরা বুঝি একটা নামও বা'র করতে পারিনে ভেবে।'

''সেই জন্যই তো বল্‌ছিলুম, রবীন্দ্রনাথকে লিখি।'

'করো তোমাদের যা খুসি,' কমল গম্ভীর হয়ে গেলো, 'ভালো কথা বললে তো শুনবে না।'

'এমন একটা নাম চাই,' আভা বল্‌লে, 'যা এর আগে কেউ কখনো শোনেনি। যা এক্কেবারে নতুন।'

'সেইজন্যই তো বল্‌ছিলুম, রবীন্দ্রনাথকে লিখি। তাঁর অত বড় প্রতিভা, তিনি কোত্থেকে একটা আশ্চর্য্য নাম খুঁজে বা'র করবেন, দেখবি হাঁ হ'য়ে যাবি তোরা সবাই। আর তাঁর দেওয়া নাম—একি কম ভাগ্যের কথা! খুকী বড় হয়ে লোককে বল্‌তে পারবে না!'

'ভারি তো!' রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আভার মনে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিলো না। সে শুধু জান্‌তো, রবিবাবু বুড়ো গোছের এক ভদ্রলোক, যিনি অনেক গান তৈরি করেছেন,. আর যাঁর হাতের লেখা অনেকটা তার দাদার লেখার মত। তাই, 'ভারি তো!' সে বললে।

কমল কিন্তু মর্ম্মাহত হলো। 'তোমরা যা খুশি করো', অমাবস্যার মত মুখ ক'রে সে বল্‌লে, 'আমাকে কেন ডেকেছো এর মধ্যে?'

সত্যি বল্‌তে, কেউ তাকে ডাকেনি। আভা একবার রঙিন পেন্সিল দিয়ে একটা নদী আঁকবার চেষ্টা করছিলো; মেজ-দা তা দেখে বলেছিলো 'বাঃ, চমৎকার হয়েছে মাঠ্‌টা।' সেই থেকে মেজ-দার বুদ্ধিসুদ্ধির উপর আভার কোনো আস্থা ছিল না।

আভা বললে, 'আহা, রাগ করো কেন?' ইস্কুলে তার সব চেয়ে প্রিয় বন্ধু মীরার সঙ্গে দু'-দিন তার কথা বন্ধ ছিলো, আজ

দ্যাখো তো মা, মাণিকটা কি করছে।

ঝগড়া শেষ হয়েছে—তারা প্রতিজ্ঞা করেছে, আর কক্‌খনো কক্‌খনো……

থাক্ সে কথা। মোট কথা, সেই কারণে আভার মেজাজটা ভালো ছিলো; সে বললে, 'এসো সবাই মিলে একটা নাম ঠিক

করা যাক্।' অবিশ্যি তার মনে মনে সন্দেহ ছিলো না যে সে যা বল্‌বে, সেইটাই সব চাইতে ভালো হবে, এবং সেটা মেনেও নেবে আর সবাই। 'মাণিক, তুই আগে বল্।'

মাণিক ফোঁস্ ক'রে উঠ্‌লো, 'আমাকে তেম্‌নি বোকা পেয়েছিস্ কিনা! আগে ব'লে দিই, আর তুই তক্ষুনি সেটা নিয়ে নে! বললেই হলো—আমিও ওটাই ভেবেছিলুম।'

আভা একবার তাকালো মাণিকের দিকে—এমনভাবে, যেন তাকে ভস্ম ক'রে ফেল্‌বে। তারপর শান্ত ভাবেই বল্‌লে, 'আচ্ছা, চঞ্চুলিকা কেমন নাম?'

কমল বল্‌লে, 'চঞ্চুলিকা—তার মানে কি?' আর মাণিক উঠ্‌লো হেসে; চঞ্চুলিকা—হাঃ-হাঃ! তা'র চাইতে গড্ডলিকা কি অট্টালিকা রাখ্ না।'

'কি, ধর্,' কমল এবার তার প্রতিশোধ নিলে, 'করকমলিকা, কি শ্যামকদলিকা, কি নীলোৎপলিকা?'

আভা একেবারে নিবে গেলো। সে কাঁদ্‌বে না ঘর ছেড়ে চ'লে যাবে, না মার কাছে গিয়ে নালিশ করবে, খানিকক্ষণ পর্য্যন্ত বুঝে উঠ্‌তে পারলে না। এমন যে হবে, সে কখনো ভাবতেও পারেনি। অবিশ্যি চঞ্চুলিকার চেয়ে অনেক ভালো নাম ছিলো তার মনে, তবে সে সেগুলো বলবে, না খুকীকে ফেলে

রাখ্‌বে তার অদৃষ্টের হাতে?—না বলাই বোধ হয় ভালো। ছেলেরা, সে বরাবর লক্ষ্য করেছে, এক-একটি জন্তুবিশেষ; কোনো কথা যদি তাদের কাছে বলা যায়!

কমল একটু ভেবে বল্‌লে, 'আমার তো মনে হয় বনশ্রী নামটি বেশ মিষ্টি।'

আভা ফস্‌ ক'রে ব'লে উঠ্‌লো, 'ভারি একটা বল্‌লে! বল্‌লেই বিশ্রী আর মিছরি মনে পড়ে।'

কমল বল্‌লে, 'তা'হলে, ধর, জয়তী।'

'ওমা, জয়তী যে আমাদের ক্লাশের একজন মেয়ে আছে।'

'এমন নাম তুই কোথায় পাবি, যা আর একজনেরও নেই? বাংলা দেশের সব মেয়ের নামই তুই জানিস্‌ নাকি?'

'ব'য়ে গেছে জান্‌তে। বেশির ভাগ মেয়ের নামই তো রমা আর ছায়া আর মায়া আর বেলা আর রেবা আর বীণা আর লীলা। এমন নাম সহজেই বা'র করা যায়, যা আর কারো নেই।'

'তুই-ই বল্‌।'

'আমি বল্‌ছি,' মাণিক হঠাৎ ব'লে উঠ্‌লো, 'সোনালি'!

'সোনালি! এ আবার নাম হয় কবে!'

এবার আভার পালা হাসবার।—'তা'র চেয়ে বল্‌না চৈতালি কি হরিতালি কি করতালি। রূপালি কি তামালিই বা মন্দ কী?'

'কেন হবে না,' মাণিক তীব্রস্বরে বল্‌লে, তোমাদের রবিবাবু যদি পদ্যে লিখ্‌তে পারেন খেয়ালী আর কাকলি আর ঝামরী— তা হ'লে সোনালিই বা হবে না কেন?'

'দ্যাখ্‌ বোকারাজ' কমল তক্ষুনি বলে উঠ্‌লো, 'রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে তুই কিছু বলিস্‌নে। চুপ ক'রে থাক্‌।'

ভারি সব দিগ্‌গজ পণ্ডিত এসেছেন এক-একজন! আমি, দেখে নিয়ো, ওকে সোনালি বলেই ডাক্‌বো।'

'তুই মহাকালী ব'লে ডাক্‌লেও এসে যায় না। কিন্তু ওর নাম হবে মঞ্জুভাষা।'

কমল বল্‌লে, 'ভারি বল্‌লি। সবাই ডাক্‌বে তো মঞ্জু বলে, আর মঞ্জু নামের হাজারখানেক মেয়ে বোধ হয় আছে দেশে।'

'তাও তো বটে। তা হ'লে রাগিণী—'

'দূর,' মাণিক বল্‌লে, শুন্‌লেই মনে হয় রেগে আছে।'

'বিম্ববতীটা কেমন? বেশ গম্ভীর আওয়াজ।'

'ঠিক জাম্বুবতীর মত।'

'দ্যাখ্‌ মাণিক, তুই যদি সব সময় ও-রকম ফাজ্‌লেমি কর্‌বি—'

'হ্যাঁ, ফাজ্‌লেমিই তো! আর তোমরা যখন করো, খুব ভালো।'

'তুই এখান থেকে যা।'

'কক্ষণো যাবো না।'

'নিশ্চয়ই যাবি।'

'ইস্ তোর কথায় নাকি?'

'আচ্ছা, যার কথায় যাবি, তাকে ডাক্‌ছি।' আভা চ্যাঁচাতে আরম্ভ কর্‌লে 'মা, মা—'

পাশের ঘর থেকে মা এলেন। 'কী হয়েছে?'

'ভ্যাখো তো, মা, মাণিকটা কী করছে।'

'কী করেছিস্ তুই, মাণিক?'

'কী আবার কর্‌বো!'

'তোরা জটলা বেঁধে এখানে কর্‌ছিস কী? পড়াশুনো নেই কারো?'

আভা তাড়াতাড়ি বল্‌লে, 'খুকীর একটা নাম ঠিক কর্‌ছিলুম, মা।'

'খুকীর নাম? খুকীর নাম আমি সীতা রাখ্‌বো। তোরা যা-ই বলিস্, সীতার মত মিষ্টি নাম কি আর আছে।'

আকাশ ভেঙে পড়্‌লো আভার মাথায়। 'কিন্তু মা, ওতো একটুও আজকালকার মত হলো না। ছি, ছি, ও-নাম তুমি কিছুতেই রাখ্‌তে পার্‌বে না।'

মাণিক সুযোগ পেয়ে বল্‌লে, 'কেন, আমার তো বেশ ভালোই লাগ্‌ছে।'

আভা ঝাঁঝালো গলায় ব'লে উঠ্‌লো, 'ইস্‌, ওর আবার একটা ভালো লাগা!'

'থাক্‌ এখন আর তোদের এ নিয়ে ঝগ্‌ড়া কর্‌তে হবে না,' ব'লে মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আভা খানিকক্ষণ ব'সে রইলো হতভম্ব হ'য়ে। শেষটায়, সীতা! আভার সব চেয়ে সখের শাড়িটা কেউ কেড়ে নিলেও সে এর চেয়ে দুঃখিত হ'তে পারতো না। তারপর সে ভাব্‌লে, মা বল্‌লেন আর অম্‌নি সবাই নামটা মেনে নিলে, তা'র কোনো মানে নেই। যে নামটা সব চেয়ে সুন্দর, সেটাই শেষ পর্য্যন্ত থাক্‌বে। তখন সে বল্‌লে, 'আচ্ছা মেজ-দা, দীপা নামটা কারো আছে ব'লে জানো?

কমল একটু ভেবে বললে, 'কই, মনে তো পড়্‌ছে না।'

মাণিক বললে, 'ওই নামে কি কেউ কাউকে ডাক্‌তে পারে? ডাক্‌বার জন্যে দেখ্‌বি ঝণ্টু কি হাসি কি ছবি ঐ গোছের একটা নামই হবে।'

আভা ক্লান্ত সুরে বললে, 'তা-ই যদি হয়, তা হ'লে এত

ভেবেচিন্তে নাম রাখাই বা কেন? একটা বিশ্রী, বিদ্ঘুটে নামে না ডাক্‌লে কারো যদি ভালো না লাগে—'

'দ্যাখ,' কমল হটাৎ ব'লে উঠ্‌লো, 'নাম তো ডাকবারই জন্যে। ডাক্‌তে সুবিধে, এমন নামই ভালো। আর তেমন একটা অসাধারণ নাম তুই পাবিই বা কোথায়? আমি বলি কী, বেশ ছোট-খাটো একটা মিষ্টি নাম রাখা যাক্।'

'যেমন?'

'যেমন ধর্ কমলা।'

'ক্ষেপেছো? আমাদের অঙ্কের টিচারের নাম কমলা—আর তাঁর যা মেজাজ।'

মাণিক বল্‌লে, 'অরুণা তো বেশ নাম।'

'না, না, অরুণা—বরুণা—তরুণা ও-সবের কাজ নয়। শুনলেই মনে হয় নভেল।'

'মালতী?' কমল বল্‌লে, 'বেশ ঠাণ্ডা নাম।'

'কচু! ঐ তো ও-বাড়িতে এক মালতী আছে—কী বিশ্রী দেখ্‌তে।'

'রাণী? যে যা-ই বলুক, রাণীর মত নাম আর নেই।'

'ঐ একটা নাম শুন্‌লেই আমার গা জ্বালা করে। যদি ওর নাম উর্ম্মিলাও হতে হয়, তবুও রাণী নয়।'

'উর্মিলাই বা মন্দ কী, ডাকবে উর্মি ব'লে।'

'নাঃ, আভা হতাশ ভাবে মাথা-ঝাঁকুনি দিলে, 'এমন বিপদে কে কবে পড়েছে! একটা নাম পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে!'

'ছ্যাখ্, নাম একটা হলেই হয়। শুন্তে-শুন্তে, ডাক্তে-ডাক্তে সব নামই মিষ্টি শোনায়।'

'নাম রাখো স্থধা', মাণিক অনেকক্ষণ পরে বল্লে, 'শুনলেই মনে হয় লক্ষ্মী মেয়ে।'

'মনে হয় ছিঁচ্কাদুনে।'

'না-হয় নিরুপমা—একটু সেকেলে অবিশ্যি, কিন্তু বেশ—মোটেও ফাজিল গোছের নয়।'

'কী-রকম মোটা মোটা নামটা।'

'নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা গেলো না। তোর যা খুশি রাখ্, আমরা হার মান্লুম।'

আভা চুপচাপ খানিকক্ষণ ভাব্লো—প্রাণপণে ভাববার চেষ্টা করলো। তার ঠোঁটটা কাম্ড়ে-কাম্ড়ে সে আর কিছু রাখ্লে না, ঘাম দেখা দিলে কপালে।

ঘণ্টা ছুই পরে আভা তার দিদির ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। 'কী রে?'

'দিদি, তোমার খুকীর জন্য একটা নাম···।'

'কী, বল্‌?'

'বনশ্রী। চমৎকার নাম—না? আর একেবারে নতুন।'

'চমৎকার। এ নিয়ে পাঁচটা হলো।'

'পাঁচটা?'

'হ্যাঁ—মা বলেছেন সীতা, বাবা বলেছেন মৃন্ময়ী, কমল—'

'মেজ্‌দা?'

'হ্যাঁ—কমল বলেছে সুধা—'

'সুধা! কখন বললে?'

'এই তো একটু আগে এসে বলে' গেলো। আর মাণিক—'

'মাণিক কী বলেছে?'

'মাণিক বলেছে রাগিণী। তোরা সবাই মিলে ওর নাম রাখ্‌ছিস্‌, আর খুকী এদিকে কী সুন্দর হাস্‌ছে দ্যাখ্‌। দুষ্টু মেয়ে, এখনই এত হাস্‌তে শিখেছে। এই খুকী খুকী—তোমার মাসি এসেছে, খুকী। খুকী, তোমার মাসিকে একটু হাসি দেখিয়ে দাও তো।'
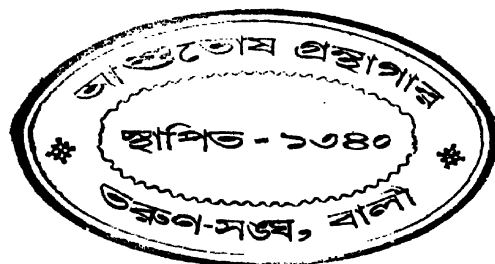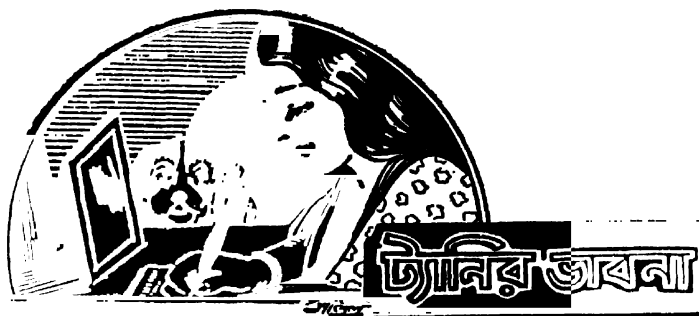
সব চেয়ে আমার খারাপ লাগে উনি যখন টেবিলের ধারে চেয়ার টেনে নিয়ে বসেন। টেবিলটার গায়ের মধ্যে মস্ত মস্ত গর্ত্ত —তার ভিতরে কত কী জিনিস। তার একটা ধ'রে উনি টান দেন —বেরিয়ে আসে কাগজ আর কলম, এমন বিশ্রী জিনিস মানুষ আর তৈরি করেনি! তারপর উনি ব'সে আছেন তো ব'সেই আছেন। কী করেন বসে বসে? আমি একদিন সামনের দু'পা তুলে মুখ উঁচু ক'রে দেখেছিলুম—কলম থেকে কালো কালো পোকার মত কী কতগুলো বেরিয়ে আসছে। বিশ্রী! আমি আস্তে আস্তে আওয়াজ করি, তাকিয়ে থাকি ওঁর মুখের দিকে, কিন্তু খেয়ালই নেই! বাবাঃ, ঐ কালো কালো পোকাগুলো নিয়ে কি ভাবনা! আমি যে এতক্ষণ পায়ের কাছে জড়সড় হ'য়ে ব'সে আছি, আমাকে একটুখানি আদর করলে কী হয়? ব'সে

থেকে থেকে আমার গা ব্যথা হ'য়ে যায় দস্তুরমত। কিন্তু উনি আমার দিকে মোটেই তাকান না। চোখ যদি তোলেন তো জানালার দিকে, বাইরে। বাইরে কী আছে? বাইরে তো কেবল দুষমনের মত বিশ্রী লোক, প্রকাণ্ড কালো এক একটা কুকুর, দেখলেই খেঁকিয়ে ওঠে। তবু যদি উনি ওঁর লাল শাড়িটা পরে একটু বেড়াতে বেরোন, আমার গায়ের ব্যথাটা অন্তত সারে। উনি সঙ্গে থাকলে আমার ভয় করে না। উনি সব করতে পারেন, উনি ঈশ্বরের মত। কিন্তু ব'সে ব'সে এই একরাশ কালো পোকা তৈরি করা—এর মানে কী? নাঃ, মানুষের কিচ্ছু বোঝা যায় না।

* * *

ঘরে ব'সেও তো কত রকম খেলা করা যায়। মনে করা যায় এই চেয়ারটা একটা বিদ্‌ঘুটে কালো কুকুর, আর টেবিলটা একটা গাড়ি। কালো কুকুরটার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে। আমি লাফিয়ে উঠে ওর গলায় কাম্‌ড়ে ওকে ঘায়েল ক'রে দেব, তারপর এই গাড়ির নিচে চাপা প'ড়ে ও মরবে। না-হয় মনে করো ঐ যে শাদা একটা কাগজ মেঝেয় প'ড়ে আছে, এটা একটা পাখি; আমি ওকে তাড়া করে অনেক ছুটোছুটির পর ঠিক ধরে ফেলব। এমনি পাখি মনে ক'রে আমি একদিন একটা কাগজকে কামড়াতে

গিয়েছিলুম—উনি দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে আমার কান ম'লে দিয়েছিলেন। কাগজ কামড়ালে রক্ত বেরোয় না—তবু কাগজের উপর এই মায়া কেন?

* * *

বাড়ির লোক ওঁকে মিনি বলে ডাকে। মিনি! মিনি! সারাদিন কেউ না কেউ ডাকছে। আমিও ডাকি, কিন্তু আমার কথা উনি বুঝতে পারেন না। আমার কথা অন্য রকম হয়ে বেরোয়।

* * * *

উনি মস্ত, ওঁর গায়ে খুব জোর। এক ধাক্কায় তিনি এই ভয়ঙ্কর ভারি দরজাটা খুলতে পারেন। ওঁর বাপ আরো প্রকাণ্ড; গাড়ির চাকার মত শব্দ ক'রে তিনি কথা বলেন। একহাতে ঐ চেয়ারটা তুলে তিনি এ-ঘর থেকে ও-ঘরে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি বড় ঈশ্বর, তাঁর কাছে যেতে হ'লে আমার চোখ বুজে আসে। ঈশ্বর, আমাকে বাঁচিয়ে রেখো, আমাকে পেট ভরে খেতে দিয়ো, আমাকে মেরো না।

আমি ছোট, আমার রঙ্ দুধের মত, বড় বড় নরম রোঁয়ায় ঢাকা আমার শরীর। আমি দেখতে সুন্দর; সেইজন্যই তো উনি আমাকে ভালোবাসেন। যখন ওঁর মন ভালো থাকে, উনি

কোলে তুলে নেন আমাকে, হাত বুলিয়ে দেন আমার গায়ে, খেলা করেন আমার সঙ্গে। তাইতে বুঝতে পারি আমি দেখতে সুন্দর। যা দেখতে বিশ্রী উনি তা ভালোবাসেন না। ওঁর

আমাকে কোলে তুলে আদর করেন

শাড়িগুলো ঝল্‌মল্‌ করছে। ট্যানি! ট্যানি! আমি লাফিয়ে উঠি, তাড়াতাড়ি ছুটে যাই, ছুটে বেরিয়ে যাই ওঁর আগেই

বাগানে, তারপর রাস্তায়—আমরা এখন বেড়াতে যাচ্ছি! বেড়াতে যাচ্ছি!

* * *

উনি আমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে বেড়াতে যান, উনি আমাকে কোলে তুলে আদর করেন, উনি আমাকে নিজের পাত থেকে খাবার তুলে খেতে দেন—তাই আমি ওঁকে ভালো বাসি। কিন্তু আমি জানি ইচ্ছে করলে উনি আমাকে মেরে ফেলতে পারেন, তাই আমি ওঁকে ভয় করি। উনি খুব ভালো; উনি আমাকে কখনো না খেয়ে থাকতে দেবেন না। কিন্তু একবার উনি যদি রাগ করেন—এমন কী আছে যা উনি না করতে পারেন। রাগ করো না, রাগ করো না আমার উপর।

* * *

এক-একদিন বিকেলে আমি হয়তো ছুটোছুটি ক'রে একটু ঘুমিয়েছি; জেগে উঠে—ওমা! বাড়িতে ওর গন্ধও তো আর পাওয়া যায় না। এই ওঁর মনে ছিল—আমাকে একা ফেলে বেড়াতে যাওয়া। রাগ হয়, রাগে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে। আজ আসুক না একবার ফিরে—কথাও বলবো না। মন খারাপ ক'রে চুপচাপ শুয়ে থাকি—তুমি ঈশ্বর, তুমি যদি আমাকে শাস্তি দাও, কী করতে পারি আমি? অনেক রাত ক'রে উনি ফিরে

আসেন—বাগানে ওর গন্ধ পাই। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে উনি ডাকেন—ট্যানি! ট্যানি! আমি সাড়া দিইনে, চুপ ক'রে শুয়ে থাকি। তখন উনি ঘরে আসেন আমার খোঁজে,আমি আমি উঠে অন্য ঘরে চলে যাই—যেন ওকে চিনিইনে। কেমন! এইবার কেমন! তারপর উনি যখন নিজের ঘরে গিয়ে ঝক্‌ঝকে বড় আয়নার সামনে দাঁড়ান, আমি চুপি-চুপি পিছন থেকে এসে লাফিয়ে এক থাবায় ওঁর চুলের খোঁপা খুলে দিই। উনি মুখ ফিরিয়ে বলেন—তুষ্টু! আমার মারতে ইচ্ছে করে, ওঁকে মারতে ইচ্ছে করে, কিন্তু সাহস হয় না। উনি যদি সত্যি-সত্যি আমার উপর রাগ করেন, কী উপায় হবে আমার! তাড়াতাড়ি আমি তাঁর জুতোর ফাঁকে মুখ লুকাই; মুখ চেপে ধরি তাঁর পায়ের উপর।

* * * *

মানুষ···মানুষ! কোঁচাওয়ালা আর শাড়ি-পরা মানুষ। এক একদিন সন্ধ্যাবেলা তারা অনেকে আসে; কথা বলে। শুনে শুনে আমার ঘেন্না ধ'রে যায়। একপাল বানরের মত কিচিরমিচির, কোনো অর্থ হয় না। আমি যখন রাত্তিরে কোনো শব্দ শুনি, রাস্তার কোনো ভিখিরির নোঙ্‌রা গন্ধ যখন পাই, তখন আমি চেঁচিয়ে উঠি। যখন গোল হয়ে শুয়ে আরামে চোখ বুজে

আসে, আস্তে, আস্তে গোঙাই। যখন খিদে পায়, মার খেয়ে যখন লাগে, তখন কঁকিয়ে কাঁদি। কিন্তু খামকা দল পাকিয়ে এমন চ্যাঁচামেচি কে কবে শুনেছে! ঠিক বানরের মত।

* * *

মোটের উপর বলা যায় শাড়ি-পরা মানুষগুলোই ভালো। কাছে গেলে অন্তত ভদ্রতা ক'রেও তারা একবার মাথায় হাত বুলোয়। কোঁচাওয়ালারা এক-একটি গোঁয়ার, কোনো খেয়ালই তাদের নেই। আমাকে তারা আমলের মধ্যেই আনে না; তাদের এমন ভাব আমি যেন নেই-ই। আর তাদের গায়ে একটা বিশ্রী গন্ধ—তামাক-পাতার। একবার তো একজন আমার লেজই মাড়িয়ে দিলেন। আমি তিড়িং ক'রে লাফিয়ে উঠলুম, কিন্তু তিনি আমার দিকে একবার ফিরে তাকালেন না পর্য্যন্ত। আর উনিও আমার কাছে এলেন না; সেই কোঁচা-ওয়ালাকে ধ'রে মার দিলেন না। দেবতার মনের ভাব বোঝা মুস্কিল।

* * *

একজন কোঁচাওয়ালা আছে—তার চেহারা আমার একটুও পছন্দ হয় না। উনি যে কী ক'রে তাকে সহ্য করেন ভেবে পাইনে। সে যখন আসে তখন আর কেউ থাকে না। মোটা

বই থেকে সে পড়ে, প'ড়ে শোনায়। আর উনি চুপ করে শোনেন ভালোমানুষের মত। আমি একদিন শোনবার চেষ্টা করেছি—মনে হয় যেন বেড়াল গোঙাচ্ছে। এতক্ষণ ধ'রে এই শোনা! উঃ, ওঁকে ভালমানুষ পেয়ে কী কষ্টই দিচ্ছে লোকটা। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা।

* * *

একদিন আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। লোকটা দরজার কাছে আসতেই ছুটে গিয়ে ঘ্যাঁক ক'রে বসিয়ে দিলুম তার পায়ে এক কামড়। মানে—বসিয়ে দিতে গিয়েছিলুম, ঠিক লাগেনি। উল্টো তার লাথিই ঠাস্ করে এসে লাগল আমার চোয়ালে। লাগলো আমারই বেশি, কিন্তু সে-কথা কে বোঝে! উনি উঠে এসে আমাকে আরো মারলেন, তারপর আমাকে হিড়-করে টেনে নিয়ে বন্ধ করে রাখলেন ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, যেখানে শুধু কতগুলো পুরোনো বাক্স জড় করা। ঘরটা অন্ধকার, ইঁদুর কিল্‌বিল্ করছে সারাক্ষণ, তাতে ঢুকতেই আমার ভয় করে। সেখানে, সেখানে আমাকে বন্ধ ক'রে রাখা! আমি চোখ দিয়ে কত বললুম, কত বোঝালুম, কিন্তু উনি আমার দিকে তাকালেন না। রইলুম বন্ধ হ'য়ে সেই অন্ধকার ইঁদুরের-গন্ধ-ভরা ঘরে। সেখানে শুয়ে শুয়ে কত যে কাঁদলুম তা কেউ দেখলে না। ক্ষমা

করো, আমাকে ক্ষমা কর, এবার আমাকে ক্ষমা করো। আমি দোষ করেছি ; আর আমি দোষ করবো না। এর পর থেকে আমি ভাল হ'বো। হে দেবতা, হে ঈশ্বর, তোমার শক্তির সীমা নেই ; ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে মেরে ফেলতে পারো। আমাকে তুমি মেরে ফেলো না।

রাত্রিতে ওঁর খাটের পায়ার কাছে আমি শুয়ে থাকি ; থেকে থেকে চমকে উঠি স্বপ্ন দেখি। শাদা বরফে ঢাকা মাঠের উপর দিয়ে তীরের মত ছুটে যাচ্ছে নেকড়ে। শাদা বরফে জ্যোছনা চক্‌চক্‌ করে ; আকাশের দিকে মুখ তুলে চীৎকার ক'রে ওঠে নেকড়ের পাল। সন্ধ্যার আবছায়ায়, বনের ঘন সবুজ থেকে লাল শেয়াল তার চোখা মুখ বার করে। তার ছুঁচল, লোভী, ধূর্ত্ত মুখ, শিয়াল-মুখ ; সে এগিয়ে যায়, সন্ধ্যার আবছায়ায়, চুপে-চুপে, হাওয়া শুঁক্‌তে শুঁক্‌তে, কোথায় মুরগী ঘুমুচ্ছে তার বাচ্চাদের নিয়ে। চোর ! চোর ! কেউ তাকে দেখতে পায় না, কেউ তাকে টের পায় না, শুধু খুপরির মধ্যে মুরগি তার গায়ের গন্ধ পায়, ভয়ে ছট্‌ফট করে ওঠে, প্রাণপণে ডানা ঝাপটায়। চোর ! চোর ! কিন্তু কে তাকে ধরবে ? তাকে চোখে দেখতে-না-

দেখতে সে চলে এসেছে বনের কিনারে, তার মুখের মধ্যে টিপটিপ করছে একটা বাচ্চা-মুরগির নরম বুক।

এই সব স্বপ্ন দেখে আমি থেকে থেকে চমকে উঠি। বাইরে কিসের শব্দ হয়! কোথায় পাতা নড়ে। হাওয়ায় জানলার একটা কবাট খুলে যায়। কে? চোর, চোর! সন্ধ্যার ছায়ার ভিতর দিয়ে আগুনের মত ছুটে চলেছে লাল শেয়াল।

আর উনি, খাটের উপর ঘুমিয়ে, উনি কী স্বপ্ন দেখেন? গাছের ডাল ধ'রে ঝুলছে নীল বানর, তার চোখে টলমল করছে আরাম। না কি অন্ধকারে হানা দিচ্ছে গরিলার ভীষণ মুখ! বিশাল মহাদেশের নতুন অরণ্য ভ'রে বানরের অর্থহীন, শ্রান্তিহীন চীৎকার। উনি কি তা শুনতে পান ঘুমের মধ্যে? ঘুমের মধ্যে ওঁর কি ভয় করে? না কি উনি স্বপ্ন দেখেন, রোদে-ভরা এক বিকেলবেলায় বেড়াতে বেরিয়েছেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে, লাল-শাড়ি প'রে?
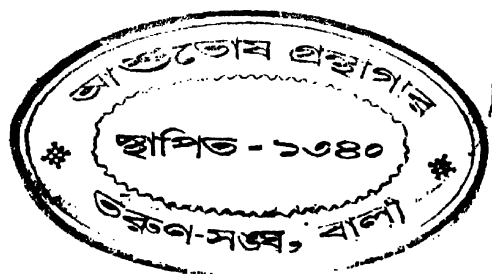
দিনে-দুপুরে

হাজরা রোডের মোড়ে ট্র্যামের জন্য দাঁড়িয়ে আছি, বেলা দুপুর। বালিগঞ্জের ট্র্যাম আর আসে না, এদিকে ভাদ্রমাসের রোদ্দুর পিঠে চড়্‌চড়্‌ ক'রে ফুটছে আলপিনের মতো। ঐ এতক্ষণে কালিঘাটের পুল থেকে আস্তে-আস্তে নামতে দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত ট্র্যামকে।

এমন সময় রাস্তা পার হ'য়ে ছোটো একটি মেয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। তাকে অত লোকের মধ্যেও আমি লক্ষ্য না-ক'রে পারলুম না। কারণ চেহারাটা তার ভদ্রঘরের মেয়ের মতোই, কিন্তু কাপড়চোপড় প্রায় ভিখিরির মতো। বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে, পরণের কাপড়টা এত নোঙরা যে আসলে যে ওটা লাল রঙের তা চেষ্টা ক'রে বুঝতে হয়। রোগা, বড্ড ফ্যাকাশে, কিন্তু মুখখানাতে কেমন একটা ম্লান লাবণ্য।

—'আপনি কি ডাক্তার?'

ভাবতেই পারিনি মেয়েটি আমাকে কিছু বলছে, তাই কথাটা শুনেও গ্রাহ্য করলুম না। কিন্তু পরমুহূর্তেই মেয়েটি সোজা আমারই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে :

—'দেখুন, আপনি কি ডাক্তার ?'

খুব অবাক হলুম, একটু যেন খুসিও হলুম—'কী ক'রে বুঝলে বলো তো ?'

'ঐ যে আপনার পকেটে বুক দেখার যন্ত্র। দেখুন, আমার মা-র বড়ো অসুখ, আপনি কি একবার একটু দেখে যাবেন ?'

মেয়েটি এমনভাবে কথাটা বললে যেন এটা মোটেও অদ্ভুত কি অসাধারণ কিছু নয়। আমি তো কী বলবো ভেবে পাচ্ছি না। এদিকে ট্রাম এসে গেছে, একটা ট্রাম ফসকালে এই দারুণ রোদ্দুরে আবার হয়তো পনেরো মিনিটের ধাক্কা।

মেয়েটি ভাঙা-ভাঙা গলায় আবার বললে: 'চলুন না, যাবেন ?'

ও-সব কথায় কান না দিয়ে ট্র্যামে উঠে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ হ'তো সন্দেহ নেই, কিন্তু কেমন দোটানার মধ্যে প'ড়ে গিয়ে পা বাড়াতেই পারলুম না। ট্র্যামটা মোড় ঘুরে আমার চোখের উপর দিয়ে ঘটরঘটর করতে-করতে বেরিয়ে গেলো।

'যাবেন তো ?'

'কোথায় তোমার বাড়ি ?'

'চেৎলায়—এই কাছেই।'

'কী হয়েছে তোমার মা-র ?'

'কী হয়েছে জানি না তো। বড়ো অসুখ।'

'কদ্দিন অসুখ?'

'অনেকদিন। ডাক্তারবাবু, আপনি যাবেন তো?'

মেয়েটির ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মায়া হ'লো; ভাবলুম, যাই না দেখে আসি ব্যাপারটা। কোনো তো কাজ নেই—না হয় নাইতে-খেতে একটু দেরি হবে।

বললুম, 'চলো।'

'ডাক্তারবাবু, আপনাকে আমি তো টাকা দিতে পারবো না—' মেয়েটি আরো কী বলতে গিয়ে ঢোক গিলে থেমে গেলো।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে-জন্যে ভেবো না', আমি তাড়াতাড়ি বললুম। নতুন পাশ ক'রে বেরিয়েছি, আত্মীয়-বন্ধু মহলে ডাক-খোঁজ পড়ে মাঝে মাঝে, কিন্তু ভিজিট দশটাকা যে-মাসে পাই, সে-মাসেই খুব খুসি। এই তো এক বন্ধুর ছেলের নিরানব্বুই বুঝি জ্বর হয়েছে, ট্র্যামের পয়সা খরচ ক'রে এসে তার প্রেস্ক্রপশন লিখে দিয়ে এতক্ষণ আড্ডা মেরে বাড়ি ফিরছিলুম। তবু এই মেয়েটিই যা হোক্ টাকার কথাটা মুখে আনলে।

হেঁটে রওনা হলুম মেয়েটির সঙ্গে কালিঘাট পুলের দিকে। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার মাকে আর-কোনো ডাক্তার দেখেননি?'

'ডাক্তার? না। মা বলতেন, ডাক্তার দিয়ে কী হবে, এমনিই

আমি ভালো হবো। তা ডাক্তার আমরা পাবোই বা কোথায় —টাকা তো নেই।'

'তুমি কি আজ ডাক্তার খুঁজতেই বেরিয়েছিলে?' জিজ্ঞেস না-ক'রে পারলুম না।

'কতদিন হ'য়ে গেলো, একমাস গেলো, মা তো ভালো হ'লেন না। জ্বর হয়, কত সময় চেঁচিয়ে ডাকলেও সাড়া দেন না—ডাক্তারবাবু, তখন আমার ভারি কান্না পায়।'

আমি বললুম, 'হুঁ। আর-কেউ নেই তোমাদের বাড়িতে?'

'নাঃ, কে আর থাকবে। এক দাদা ছিল আমার, সে তো চটকলে কাজ করতে গিয়ে রেলেই কাটা পড়লো। সেই থেকে আমি আর মা। বেশ তো ছিলুম আমরা—এর মধ্যে কেন অসুখ করলো মা-র? ডাক্তারবাবু, মা কদ্দিনে ভালো হবেন?'

আমি ডাক্তারি ধরণে হেসে বললুম, 'সে এখন কী ক'রে বলি? চলো, দেখি তো।'

'ডাক্তারবাবু, আজ সকাল থেকে মা যেন কেমন হ'য়ে আছেন—একবার চোখ মেলেও তাকান না। আমি দেখুন বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে-ছুটতে এতদূর এসেছি, যদি কোনো ডাক্তার খুঁজে পাই, যদি আমার উপর কোন ডাক্তার দয়া করেন। ঐ তো সব ওষুধের দোকান, ভিতরে পাৎলুন-পরা ডাক্তাররা ব'সে

—আমার তো সাহস হয় না ভিতরে ঢুকতে। রাস্তার এদিক থেকে ওদিক কেবলই ঘুরছি, এমন সময় আপনাকে দেখলুম। আপনাকে দেখেই মনে হ'লো আপনি আমাকে দয়া করবেন। মা সেরে উঠলে আপনি একদিন এসে খাবেন আমাদের বাড়ি— কী চমৎকার লাউয়ের পাতা দিয়ে মটরডাল রান্না করেন মা— ছি-ছি, এটা কী বললুম, আপনারা কেন গরিবের বাড়িতে খেতে আসবেন—ডাক্তারবাবু, আপনার দয়া কোনোদিন ভুলবো না।'

আমি মামুলিভাবে বললুম, 'না, না, দয়া আর কী, লোকের অসুখ সারানোই তো আমাদের কাজ।' কিন্তু মনে-মনে বেশ একটু গর্ববোধ না-ক'রেও পারছিলুম না। হাজার হোক্ একটা মহৎ কাজে চলেছি তা তো ঠিক।

'ডাক্তারবাবু, আপনার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে?'

'কিচ্ছু না। চলো।'

মুখে বললুম বটে, কিন্তু কালিঘাট পুল পর্য্যন্ত আসতে-আসতেই মনে হ'তে লাগলো এই মহৎ কাজের ভারটা না নিলেই পারতুম। এমন কত গরিব দুঃখী আছে, বিনা চিকিৎসায় ধুঁকতে ধুঁকতে মরছে, মরছে না খেয়ে—তাদের সকলের উপকার করতে গেলে নিজেরই বাঁচা দায়।

পুল থেকে নেমে বাঁ দিকের রাস্তা নিলুম।

'আর কত দূর ?'

আমার প্রশ্নে নিতান্ত ব্যাকুল হ'য়ে মেয়েটি বললে, 'এই তো—আর একটুখানি। আমার পয়সা নেই, তাহ'লে নিশ্চয়ই আপনাকে গাড়ি ক'রে নিতুম। ওঃ, কত কষ্ট হ'লো আপনার!'

'বাঃ, এইটুকু রাস্তা হাঁটতে পারবো না ?'

এতক্ষণে আমার শরীর দিয়ে যেন আগুন ছুটছে। রুমাল বা'র ক'রে ঘাম মুছলুম! তক্ষুণি মনে হ'লো এই দিব্যি জোয়ান শরীর নিয়ে আমার হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে, আর মেয়েটা! ঐটকু তো মেয়ে—ছুটতে-ছুটতে চলেছে আমার সঙ্গে, ওর সুবিধের জন্য আমি তো একটু আস্তেও হাঁটছি না। কত যেন ঘুরেছে ও, হয়তো কতদিন ওর ভালো ক'রে খাওয়াও হয় না, মা অসুখে প'ড়ে, কে খেতে দেবে। ওর একটু ক্লান্তির ভাব নেই, এই গনগনে রোদ—তাও যেন ওর গায়েই লাগছে না! আমার ভিতরটা কেমন একটু সঙ্কুচিত, লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। কষ্ট হচ্ছে ব'লে নিজের উপর রাগ হ'লো যেন।

অনেক গলিঘুঁজি পেরিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এসে পৌছলুম। কলকাতার এ অঞ্চলে কোনোদিন আর আসিনি—সত্যি বলতে, জায়গাটা ঠিক কলকাতাই নয়। একেবারেই পাড়াগাঁ, পুকুর, বনজঙ্গল, কিছু পাকা বাড়ি, কিছু বা খড়ের ঘর। একটা অতি

জীর্ণ, শ্যাওলা-ধরা, খ'সে-পড়া একতলা পাকা বাড়ির সামনে মেয়েটি এসে বললে, 'এই।'

ভিতরে ঢুকে দেখি, মেঝের উপর মলিন বিছানায় একজন স্ত্রীলোক নিঃসাড় হ'য়ে শুয়ে। চোখ তার আধ-বোজা, খানিক পর-পর নিশ্বাস পড়ছে জোরে-জোরে।

মেয়েটি তার কানের কাছে মুখ দিয়ে ডাকলে, 'মা, মা।'

কোনো জবাব এলো না।

'মা, মা, তোমার জন্যে ডাক্তার নিয়ে এসেছি, চেয়ে ছাখো। মা, এই ডাক্তারবাবু তোমাকে ভালো করবেন।'

চোখ ছুটো একবার পলকের জন্য খুলেই আবার বুজে এলো। একখানা হাত বুঝি একটু ওঠবার চেষ্টা করলো, অস্ফুট একটু আওয়াজ হয়তো বেরুলো গলা দিয়ে।

মেয়েটি বললে, 'ডাক্তারবাবু, ভালো ক'রে দেখুন, মাকে আজই ভালো ক'রে দিন।'

কিন্তু বেশি কিছু দেখবার ছিল না। আর একটু পরেই নাভিশ্বাস স্থুরু হবে। তবু আমরা ডাক্তাররা সব সময়ই একবার শেষ চেষ্টা ক'রে থাকি।

তাড়াতাড়ি বললুম, 'তুমি একটু বোসো খুকি, আমি এক্ষুনি ওষুধ নিয়ে আসছি।'

মেয়েটি বললে, ডাক্তারবাবু, আপনি আবার আসবেন তো? আমার মা ভালো হবেন তো?'

'এক্ষুনি আসছি ওষুষ নিয়ে', ব'লে আমি বেরিয়ে গেলুম। ছুটতে-ছুটতে সেই কালিঘাটের পুল, তারপর ট্রামে, ভবানীপুরে এক চেনা ডিস্‌পেন্সারি থেকে একটা ইন্‌জেকশন কিনলুম, ধার ক'রে নিলুম একটা ইন্‌জেকশন-এর ছুঁচ। হাঁপাতে-হাঁপাতে আবার যখন গিয়ে পৌঁছলুম, ততক্ষণ ঘণ্টা দেড়েক তো নিশ্চয়ই কেটেছে।

ফেরবার সময় রাস্তাটা বোধ হয় কিছু গোলমাল হয়েছিল, একটু ঘুর-পথে এসে সেই বাড়ীর সামনে দাঁড়ালুম। রোদ্দুরে ছুটোছুটি ক'রে তখন আমি কানে পিঁ-পিঁ আওয়াজ শুনছি। কিন্তু ডাক্তারের স্বাস্থ্যের কথা ভাববার সময় তখন নয়। ভিতরে ঢুকতে ঠিক যেন পা সরছিলো না, কে জানে গিয়ে কি দেখবো। সামনের দরজাটা হাঁ-করা খোলা, তাড়াতাড়ি গিয়ে ঢুকলুম, কিন্তু ঢুকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

তবে কি আমি ভুল বাড়িতে এলুম। না, ঐ তো সেই পুকুর, সেই সুরকির রাস্তা, ঐ দুটো সুপুরিগাছ। দেড় ঘণ্টা আগে এই ঘরটাতেই তো এসেছিলুম মেয়েটির সঙ্গে কিন্তু মেয়েটি কোথায়? তার মুমূর্ষু মা-ই বা কোথায় গেলো? ঘরে জিনিষ-

পত্র অবশ্য খুব কমই ছিল, কিন্তু যে-ক'টা ছিল, সে-কটাই বা দেখছি না কেন ?

অবাক হ'য়ে দেখলুম, ঘরটা একেবারে খাঁ-খাঁ খালি। শিগ্‌গির যে এখানে কোনো মানুষ বসবাস করেছে এমন চিহ্নও কিছু নেই। আমি এগিয়ে গেলুম, ওদিকে আর-একটা ঘর, সেটার দেয়ালে কালিঝুলি মাখা, কোণে একটা ভাঙা উনুন, বিবর্ণ একটা ঘটি প'ড়ে আছে।

তবে কি ওর মা এর মধ্যেই ম'রে গেলো, আর ও মাকে নিয়ে চ'লে গেলো কেওড়াতলায় ? এত অল্প সময়ের মধ্যে কী ক'রে তা হ'তে পারে ? ঘরে কিছু জিনিষপত্র ছিল, একটা লণ্ঠন, দু' একটা থালা-বাটি···সেগুলো ?

আস্তে-আস্তে আমি বাইরে এসে দাঁড়ালুম। তবে কি সমস্ত জিনিসটাই আমার চোখের ভুল···মনের ভুল ? এই রোদ্দুরে কি আমার মাথা খারাপ হ'য়ে গেলো ? এই তো আমি ঠিক দাঁড়িয়ে, আমার পকেটে ইন্‌জেকশন, সবই ঠিক আছে। নাকি আমি পথ ভুল ক'রে ভুল বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছি ?

ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছি, মাথার উপর যে আগুন ঝরছে সে-খেয়ালও নেই। চারদিক ছবির মতো চুপচাপ। হঠাৎ দেখি, টাক-পড়া আধা-বয়েসি একটা লোক আমার পাশে এসে

দাঁড়িয়েছে। কোনোখানে কেউ ছিল না, লোকটা যেন হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে উঠে এলো। তার দিকে তাকাতেই সে বললে, কী মশাই, বাড়িখানা কিনবেন নাকি?'

'আপনারই বাড়ি বুঝি?'

লোকটা ঠোঁট উল্‌টিয়ে বললে, 'হ্যাঁ মশাই, আইনত আমারই। কপালে দুর্ভোগ থাকলে খণ্ডাবে কে? কোথাকার এক বিধবা পিসি, জন্মে দু'বার চোখেও দেখিনি, মশাই—সংসারে কেউ কোনোখানে নেই—আইনের প্যাঁচে ঘুরতে-ঘুরতে বাড়িখানা এসে পড়লো আমারই ঘাড়ে। আর বলেন কেন—এমন কপাল নিয়েও আসে মানুষ। পিসে টেঁসলেন তিরিশ বছরে, কুড়ি বছরের ছেলেটা রেলে কাটা পড়লো, পিসি যখন স্বর্গে গেলেন, ভাবলুম ভালোই হ'লো। একটা মেয়ে ছিল—' হঠাৎ থেমে গিয়ে অন্যরকম সুরে লোকটা বললে, 'ও-সব লোকের কথায় কান দেবেন না মশাই, একদম বাজে কথা।'

আমি কথা বলার জন্যে হাঁ করলুম, কিন্তু আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরবার আগেই লোকটা ব'লে চললো; 'ঐ তো এক-ফোঁটা বারো বছরের মেয়ে, তা মা-টা যেদিন অক্কা পেলো, পরের দিন ও দিব্যি কড়িকাঠ থেকে ঝুলে পড়লো। একখানাই সাড়ি ছিলো পরণে, সেটা দিয়েই কম্ম সারলো। কী ডেঁপো মেয়ে

মশায়—থাকলে একটা বিয়ে-টিয়ে দিয়ে দিতুম, বাড়িখানা ছিলো তিনপুরুষের, একরকম চ'লে যেতো। তা লোকে যা বলে সব বাজে কথা, মশাই—হ্যা, ভূত না হাতি! আপনি তো এডুকেটেড লোক, আপনিই বলুন, ও সব কথায় কি কান দিতে আছে! নিতে চান তো খুব সস্তায় ছাড়তে পারি। সবসুদ্ধ পাঁচশো টাকা —আচ্ছা, হড়েগড়ে চারশোই দেবেন, যান। জলের দরে পাচ্ছেন, জমিটুকু তো রইলো, আপনি ইচ্ছেমত বাড়ি তৈরি ক'রে নেবেন। কী বলেন?'

অতি ক্ষীণস্বরে আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'কদ্দিনের কথা এটা?'

'কোন্‌টা? এই পিসির···তা দু' বছর হবে। পিসির জন্যে তো কোনো ভাবনা ছিল না, মশাই, মেয়েটার জন্যে বাড়িটার এমন বদ্‌নাম হয়েছে যে পাঁচটাকাতেও কেউ ভাড়া নেয় না। এদিকে ট্যাক্সো তো গুণতে হচ্ছে আমাকেই। কী বিপদে পড়েছি, গিলতেও পারিনে, উগরোতেও পারিনে। আমি গরিব মানুষ, আমার উপরে এ জুলুম কেন? থাকি কাঁচড়াপাড়ায়, রোজ-রোজ এসে যে তদ্বির করবো তারও উপায় নেই। আপনি নিন না বাড়িটা কিনে—আচ্ছা, কী দেবেন আপনিই বলুন···বলুন না।'

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

মণ্টুর মাস্টার

হাসির-গল্প-লিখিয়ে শিবরাম বাবুর লেখার সঙ্গে তোমাদের নিশ্চয় পরিচয় আছে। শিবরামবাবুর লেখা গল্পের বিষয়বস্তু যেমন হাস্যকর, তেমনি বলবার ধরণে, শব্দচয়নেও হাসির উৎস ঝরে পড়ে। তাই শিবরাম বাবুর গল্প পড়তেও হাসি পায়, বলতেও হাসি পায়। সব চেয়ে বেশি হাসি যাতে আছে, এমন সব গল্প বেছে নিয়ে এই বইখানি বের করা হ'ল।

দ্বিতীয় সংস্করণ **দাম ছয় আনা**

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগৌরাঙ্গ বসু

জীবনের সাফল্য

মণ্টুর মাস্টারের মতই তেমনি চমৎকার, তেমনি মজার সব হাসির গল্প। শিবরাম বাবুর সঙ্গে যোগ দিয়েছেন গৌরাঙ্গ বাবু, যিনি অল্পদিনেই হাসির গল্প লিখে নাম কিনেছেন। হাসতে হাসতে পেটের নাঁড়ি ছিঁড়ে গেলে এঁরা কিন্তু দায়ী নহেন।

দাম ছয় আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

গল্প ঠাকুরদা

তোমাদের কত বন্ধুবান্ধব নাওয়া, খাওয়া, পড়াশুনার মধ্যে কেমন সব মজার মজার গল্প গড়ে তুলে, তা হয় ত তোমাদের চোখে পড়ে না, কিন্তু "গল্প ঠাকুরদার" মুখে শুনলে অবাক্ হবে। ভাববে—তাই ত! এতেও এত মজার গল্প হয়!

দাম ছয় আনা

শ্রীবুদ্ধদেব বসু

এক পেয়ালা চা

বুদ্ধদেব বাবু নতুনের পূজারী। তোমরাও নতুন, নতুনকে তোমরাই আবাহন করবে। এ বইয়ের প্রত্যেকটি গল্প নতুন ঢঙে লেখা—নতুন অদ্ভুত আইডিয়া—প্রচ্ছন্ন হাসি, যা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। **দাম ছয় আনা**

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

লালন ফকিরের ভিটে

সুনির্ম্মলবাবুর লেখার মধ্যে একটা হাল্কা হাসি ও রহস্যের স্রোত বয়ে যায়। তাই বার বার পড়লেও কখনো পুরোনো ঠেকেনা। সব গল্পগুলি নামকরা।

দ্বিতীয় সংস্করণ **দাম ছয় আনা**

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

পরীর গল্প

রূপকথার গল্প। প্রত্যেকটি গল্প মধুময়। তোমাদের মনকে ধীরে ধীরে বাস্তব থেকে কল্পলোকে পরীর রাজ্যে নিয়ে যাবে—ভুলে যাবে তুমি গল্প পড়ছ। মনে হবে তুমিই যেন গল্পের নায়ক—পরীর রাজ্যের অদ্ভুত সব কাণ্ড তোমার চোখের সামনে ঘটছে। কি আশ্চর্য্য! **দাম ছয় আনা**

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

মা[illegible]র ভূত

তোমরা ভূতকে আর ভয় কোর না। ভূতকে জব্দ করবার উপায় এ বইতে দেওয়া আছে। মানুষের বুদ্ধির কাছে ভূত কেমন জব্দ হয়, একবার দেখে নাও। ভয়ের বদলে পাবে হাসির ফল্গু ধারা।

দ্বিতীয় সংস্করণ **দাম ছয় আনা**

শ্রীসুধাংশু দাশগুপ্ত

বুদ্ধির লড়াই

কয়েকটি সুন্দর গল্প। প্রত্যেকটি গল্পে নায়কদের বুদ্ধির লড়াই একটা পড়বার মত জিনিস।

দাম ছয় আনা

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

অঞ্জলি

গোষ্ঠবাবুর অন্যান্য বইয়ের মতই এ বইখানাও শিক্ষাপ্রদ গল্পগুলি। প্রত্যেকটি গল্প যেন হীরের টুক্‌রো।

দাম ছয় আনা

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

নীতিগল্পগুচ্ছ

পারস্য কবি শেখ সাদীর অসংখ্য নীতিগল্পের সাজি—ফুলের মত সৌরভময়—কত ছবি, কত গল্প।

চতুর্থ সংস্করণ — দাম ছয় আনা

শ্রীগোষ্ঠবিহারী দে

গল্পবীথি

কয়েকটি সরস গল্পের সাজি। কল্পনায়, মাধুর্য্যে, ভাবের লালিত্যে লালিত্যময়।

দ্বিতীয় সংস্করণ — দাম ছয় আনা

যাইবে। দশ আনার বই যাঁরা ছ'আনায় দেয় তাঁহাদের পাঁচসিকার বইয়ের কত দাম হওয়া উচিত, রুল অফ থ্রি করিয়া আবিষ্কার করিতে হয়। ছবি ও গেট-আপ প্রলোভনময়। নূতন জামা কাপড়ের চেয়ে এ বই পেলে ছেলেমেয়েরা বেশী খুসি হইবে।

"রংমশাল" বলেন—এত সস্তায় বই কেমন করে বার করেন ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয়। শুনেছি তাঁদের উদ্দেশ্য বাংলার ঘরে ঘরে তাঁদের বই পৌছুক। **আরতি** তোমাদের পূজার ছুটী কাটাবার মস্ত বই। গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধে সবশুদ্ধ ৪৯টী। ছবিও অনেক। বইটির আয়তনের তুলনায় দাম সস্তাই বলতে হবে।

"মাসপয়লা" বলেন—এই বৃহৎ পূজা-বার্ষিকী খানা হাতে পাইলে লম্বা ছুটির কয়দিনের জন্য শিশুরা নিশ্চিন্ত হইবে। এতে গল্প, হাসির কবিতা, মজার ছবি প্রভৃতি আছে। শিশুমহলে **আরতি** আদর লাভ করিবে।

"রামধনু" বলেনঃ—এই বিপুল কলেবর বার্ষিকী খানা নিয়ে শিশুরাজ্যে হাজির হয়েছেন। এতে বাংলার বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিকদের লেখা অজস্র গল্প ও নানা বৈচিত্র্যময় প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে—ছবিও অনেক আছে। এ বই শিশুমনের খোরাক যোগাতে পারবে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। এর পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৪৫০, দাম মাত্র ১।০।

"মৌচাক" বলেন—এই বার্ষিকীখানি সম্পাদন করেছেন শিশুদের প্রিয় লেখক শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসু। হাসির কবিতা ও মজার গল্পের এই বইখানি পড়িয়া শিশুরা মুগ্ধ হইবে।

"পরিকথা" বলেন—দিব্য অঙ্গ-লাবণ্যে মনোহর বর্ণিকায় শ্রীযুক্ত সুনির্ম্মল বসুর হাত ধরিয়া **"আরতি"** বাহির হইল। ইহাকে সাজাইয়াছেন শ্রীযুক্ত সজনী দাস, শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। পাঁচসিকা দর্শনী দিয়া কোথায় কিরূপ মানাইল বিচার করুন।

"জলছবি" বলেন—বাংলা দেশে যাঁরা ছোটদের জন্য লিখে খ্যাত হয়েছেন, দের সকলেরই গল্প, কবিতা ও অন্যান্য জাতের রচনা এই বইয়ে সংগৃহীত হয়েছে। সুন্দর সুন্দর ছবি দিয়ে সেই সব রচনাকে আবার সাজিয়েও দেওয়া হয়েছে। ছেলে-মেয়েরা এই বই হাতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হবে। জিনিসের তুলনায় দামও এর যথেষ্ট সস্তা।

এ ছাড়া 'আরতির' আরও অনেক প্রশংসাপত্র ও সমালোচনা পাইয়াছি, কিন্তু স্থানাভাব বলে আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইতে বাধ্য হইলাম।